গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৭ মে - ২ জুন, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ নিলেন শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের অধিকারী হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের রাজভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে ২০ মে। এই উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট জনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শ্রী মুকুল রায় ১৯ মে এস ইউ সি আই (সি) কার্যালয়ে এসে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য এস ইউ সি আই (সি) নেতাদের আমন্ত্রণ জানান।

২০ মে রাজভবনের অনুষ্ঠানে এস ইউ সি আই (সি)র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ, সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও নবনির্বাচিত বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর। ঐ অনুষ্ঠানেই উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কমরেড সৌমেন বসু বলেন, ''আমরা বরাবরই বলেছি, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতা থেকে সিপিএমকে সরানোর উদ্দেশ্যেই আমরা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছি। সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। মুকুল রায় আমাদের পার্টি অফিসে এসেছিলেন। বলেছেন, আমাদের মধ্যে যেন সুসম্পর্ক বজায় থাকে। আমরাও তাঁকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেছি, দেখবেন যেন আমাদের সুসম্পর্ক নষ্ট না হয়।''

বিদায়ী সরকারের নির্দেশে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ল। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ

আবারও মাশুল বাড়ল বিদ্যুতের। রাজ্যের মানুষ যখন নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে, সেই সময় সম্পূর্ণ চুপিসারে বিধানসভাকে এড়িয়ে গিয়ে এই মাশুল বাড়ানো হল। ফলাফল ঘোষণার পরের দিনই সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফুয়েল সারচার্জ বা ভ্যারিয়েবল চার্জের অজুহাতে সিইএসসি-তে (কলকাতায়) ইউনিট প্রতি ৪৬ পয়সা এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে (এসইডিসিএল) ইউনিট প্রতি ৩৮ পয়সা মাশুল বাড়ানো হল। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এই মাশুলবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত

আটের পাতায় দেখুন

১৯ মে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সল্টলেক অফিসে কমিশনার প্রসাদরঞ্জন রায়কে বিদ্যুৎগ্রাহকদের ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিবাদ

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৌমেন বসু ১৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, এপ্রিল মাস থেকে সিইএসসি-তে ইউনিট প্রতি ৪৬ পয়সা এবং বিদ্যুৎ বণ্টন

আটের পাতায় দেখুন

ওড়িশায় উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

দক্ষিণ কোরিয়ার বহুজাতিক সংস্থা 'পসকো'র সাথে ওড়িশা সরকারের স্বাক্ষরিত মৌ বাতিল, পসকোর জন্য জমি দখল বন্ধ করা, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র প্রত্যাহার করা প্রভৃতি দাবিতে ২৩ এপ্রিল সারা ওড়িশা প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। একই দাবিতে ১৮ মে ভুবনেশ্বরে যুক্ত-বিক্ষোভে সামিল হয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), সিপিআইএমএল(লিবারেশন), সিপিআইএমএল-নিউ ডেমোক্রেসি প্রমুখ বামপন্থী দল। রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেন চার বাম দলের নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন ঢিনকিয়া-বালিটুথাতেও বিশাল বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ওখানেই পস্কোর প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে জোর করে চাষিদের জমি কেড়ে নেওয়ার কাজে নেমেছে সরকার। পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটির সাথে যুক্তভাবে এই বিক্ষোভ সংগঠিত করার উদ্যোগ এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়। কমরেডস সুভাষ সাঁই, প্রদীপ্ত রাম, বিশ্বরঞ্জন সামল, প্রকাশ দাস প্রমুখ পার্টি কর্মীরা জগৎসিংহপুর জেলার ঢিনকিয়া, নুয়াগাঁও ও গড়কুজঙ্গ অঞ্চলে সংগ্রামী জনগণের সাথে থেকেই আন্দোলন গড়ে তোলায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিচ্ছেন।

কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান-এর অষ্টম কংগ্রেস

কমরেড প্রভাস ঘোষের শুভেচ্ছাবার্তা

(কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তানের অষ্টম কংগ্রেস উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে শুভেচ্ছাবার্তাটি পাঠিয়েছেন, তা প্রকাশ করা হল।)

সাধারণ সম্পাদক
কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান
প্রিয় কমরেড,

আপনাদের পার্টির অষ্টম কংগ্রেস ১১-১৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমরা খুবই আনন্দিত। পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য আপনাদের দল যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে তার প্রতি আমাদের প্রিয় দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি মানুষের পক্ষ থেকে আমি সংহতি জানাচ্ছি। একই সাথে এই কংগ্রেসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি এবং আপনাদের দলের সকল নেতা ও কর্মীদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কমরেডস, এমন একটা সময়ে আপনারা এই পার্টি কংগ্রেস করছেন, যখন গোটা বিশ্ব এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী অভূতপূর্ব সংকটের সামনে পড়ে শ্রমজীবী জনগণের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে আনছে, অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষ পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং অতি সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য অংশের শোষিত জনগণের সুতীব্র আন্দোলন এই সত্যকেই তুলে ধরছে।

এই আন্দোলনগুলির মধ্যে ঐ সমস্ত দেশে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা দুঃখের সাথে দেখছি যে, এই আন্দোলনগুলি কিছু আশু দাবি আদায়ের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা লেনিনের এই শিক্ষাকেই আবার সত্য প্রমাণ করছে যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া যেমন বিপ্লব হয় না, তেমনি একটি বিপ্লবী দল ছাড়াও বিপ্লব হতে পারে না। এই কারণেই সর্বহারাশ্রেণীর একটি যথার্থ বিপ্লবী পার্টি প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব এত বিরাট। পাকিস্তানে সর্বহারাশ্রেণীর একটি প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গঠন করার জন্য আপনাদের আন্তরিক সংগ্রাম একটি ঐতিহাসিক সংগ্রাম, যাকে আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

পাঁচের পাতায় দেখুন

দারিদ্র্যের সরকারি হিসাব
শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার দারিদ্র্যরেখাটিকে আরও নামিয়ে দিয়েছে। এ দেশে শহরাঞ্চলে দিনে ২০ টাকা যাঁর আয়, ভারত সরকারের হিসাবে তিনি আর গরিব নন। ফলে বিরাট সংখ্যক মানুষের আয় এক পয়সাও না বাড়লেও তাঁরা এখন দারিদ্র্যরেখার উপরে চলে গিয়েছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বার বার দারিদ্র্য কমিয়ে দেখানোর জন্য দারিদ্র্যরেখা নামিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ফতোয়া মতো বর্তমানে শহরাঞ্চলে মাসে ৫৭৮ টাকা হল দারিদ্র্যরেখা। অর্থাৎ দৈনিক আয় ২০ টাকা হলেই বিপিএল এর সরকার ঘোষিত সুবিধা দাবি করা যাবে না। বলা বাহুল্য এই কুড়ি টাকার মধ্যে খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা— সবরকম খরচ ধরা আছে। যেমন মাথা পিছু দৈনিক চাল গমের খরচ ধরা হয়েছে ৩.২২ টাকা। সবজির খরচ ধরা হয়েছে ১.২২ টাকা। মাসিক শিক্ষা খরচ ধরা হয়েছে ১৮.৫০ টাকা। এই হিসাব যাঁরা করেছেন তাঁরা হয় বাজারের কোনও খবর রাখেন না, অথবা সাধারণ মানুষকে মনে করেন তাদের পশুখাদ্যেই চলে। বাজারে চালের যা দাম তাতে মোটা ধরনের খাওয়ার যোগ্য চালের দাম কিলোপ্রতি কুড়ি টাকার কম নয়। দৈনিক তিন টাকায় শুধু নুন ভাত খেতে হলেও মাত্র এক দেড়শো গ্রাম চালের ভাত জুটতে পারে। এই নিষ্ঠুর সরকারের বিচারে সেটাই যথেষ্ট। মাসিক ১৮.৫০ টাকায় কোন স্কুলে পড়া যায় তা কেন্দ্রীয় সরকারই বলতে পারে। আসলে সরকার দেখাতে চায় বিশ্বায়ন ও নয়া আর্থিক নীতির ফলে দেশে গরিবি কমছে। অসহায়, নিরন্ন মানুষের দারিদ্র্য নিয়ে এই নির্লজ্জ তামাসা বোধহয় কেবল পুঁজির পদলেহীদের পক্ষেই সম্ভব।

এর শুরু হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে ইন্দিরা গান্ধীর 'গরিবি হঠাও' স্লোগান দিয়ে। ঐ সময় এক দিকে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি আরও সংহত হয়েছে, তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র আরও প্রকট হয়েছে, নেপাল বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর ভারতের দাদাগিরি বেড়েছে। অন্য দিকে 'গরিবি হঠাও' স্লোগান 'গরিব হঠাও'তে পরিণত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মনমোহন সিংয়ের আমলে ঘোষিত হয়েছে নয়া আর্থিক নীতি। নয়া আর্থিক নীতির ঘোষণায় মনমোহন সিং বলেছিলেন, পাঁচ বছর পরে মানুষ এর সুফল বুঝতে পারবেন; পাঁচ বছর পরে দেশের মানুষের বেহাল অবস্থা দেখে তিনি বললেন, সুফল পেতে আরও পাঁচ বছর লাগবে। দশ বছর পরে দেখা গেল গরিব আরও গরিব হয়েছে, আর মুষ্টিমেয় মানুষ কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে। দারিদ্র্য যখন কমল না তখন থেকে শুরু হল দারিদ্র্যরেখা নামানোর খেলা। ২০০১ সালেও যেখানে দারিদ্র্যরেখার নিচে ছিল ৩৫ শতাংশ মানুষ, ২০০২ সালে এক লাফে দশ শতাংশ কমিয়ে করা হয়েছে ২৫ শতাংশ।

১৯৭৩-৭৪ সালে যখন ভারতীয় পুঁজিবাদ জনগণের বিরুদ্ধে আজকের মতো এতটা বেপরোয়া হয়নি, তখন সরকার দারিদ্র্যরেখা নির্ধারণের জন্য ন্যূনতম পুষ্টিকে মাপকাঠি ধরে নিয়েছিল। তখন সরকারি হিসাবে ধরা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে ২৪০০ ক্যালরি ও শহরে ২১০০ ক্যালরি পরিমাণ পুষ্টির জন্য যে টাকাটা দরকার সেটাই দারিদ্র্যরেখা। তার নিচে যাঁরা আছেন তাঁরা দরিদ্র— এটাই ধরা হয়েছিল। কিন্তু বছর বছর গরিবি কমিয়ে দেখাবার জন্য ২০০৪-০৫ সালে প্রয়োজনীয় ক্যালরির পরিমাণ ২৪০০ ক্যালরি থেকে ১৮২০ তে নামিয়ে আনা হয়। বাস্তবে মাথা কেটে মাথা ব্যথা সারাবার মতো করে গরিবি রেখা নামিয়ে বেশি বেশি মানুষকে গরিবি রেখার উপরে টেনে তুলে, সরকার তার আর্থিক নীতির সাফল্য ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই গরিবি নিয়ে অর্থনীতি বিশারদদের মতামতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গিয়েছে।

ষাটের দশকে পি ডি ওঝার হিসাব মতো ২,২৫০ ক্যালরি পরিমাণ পুষ্টির নিরিখে দেশে ১৯ কোটি মানুষ (৪৪ শতাংশ) ছিল দারিদ্র্যরেখার নিচে। এর সাথে বি এস মিনহাসের হিসাব মেলেনি, মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া বা বিশ্বব্যাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু যে যাই হিসাব দিন, সরকারি হিসাবে দেশে দিনে দিনে দারিদ্র্য কমেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য ক্রমশ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। টাটা বিড়লা বা আম্বানিদের সম্পদ বাড়তে বাড়তে আকাশ ছুঁয়েছে। দেশে একদিকে বড়বড় শপিং মল হয়েছে, আইনক্স হয়েছে, উড়াল পুল ধরে ছুটছে বিদেশি গাড়ি, আর তার ধোঁয়া খাচ্ছে খালপাড় রেলধারের বস্তিবাসী কোটি কোটি মানুষ। দিল্লি শহর সাজানো হয়েছে, আর পাশে তৈরি হয়েছে গাজিয়াবাদের বড় বড় বস্তি। আশ্রয় অধিকার অভিযান নামে একটি বেসরকারি সংগঠন ২০০০ সালে দিল্লিতে সমীক্ষা করে দেখেছিল ৫৩ হাজার মানুষ খোলা আকাশের নিচে রাত কাটান। দেশের আর্থিক রাজধানী বোম্বাইয়ে আকাশচুম্বী বহুতল ফ্ল্যাটের পাশে তৈরি হয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ধারাভি বস্তি। বোম্বাইতে ফুটপাথবাসীর ওপর কাজ করতে গিয়ে বিষ্ণু এন মহাপাত্র দুঃখ করে বলেছিলেন, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সরকারি তথ্য পাওয়া যায় না। বিগত পঁয়ত্রিশ বছর সি পি এমের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে উড়ালপুলের তলা, খালপাড়, রেলধারে পা রাখার জায়গা নেই। দরিদ্রদের মধ্যে আবার সংখ্যালঘুদের অবস্থা শোচনীয়। ২০০৪-০৫ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড রিসার্চের সমীক্ষায় উঠে এসেছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে তিরিশ শতাংশ দৈনিক ২০ টাকা খরচ করতে পারে না।

সরকার দারিদ্র্য দূর করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত কবি নজরুলের ভাষায় 'মানুষে না মেরে' 'মনুষ্যত্বে মারতে' চেষ্টা করছে। গরিব মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক সহানুভূতির মনোভাবকেই তাঁরা মেরে দিতে চাইছে। নয়া আর্থিক নীতিতে তাঁরা একটা ভারতের মধ্যেই দুটো ভারত তৈরি করছে। এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করছে যাতে মধ্যবিত্ত মানুষ এবং আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চিনের প্রাচীর তৈরি করা যায়। কিন্তু তবু কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর মতো মাঝে মাঝে সত্য উঁকি দিয়ে যায়। যেমন অর্জুন সেনগুপ্তের রিপোর্ট। তাঁর নেতৃত্বে 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় কমিশনের' রিপোর্ট বলছে, ২০০৪-০৫ সালে দেশে ৮৩ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের, অর্থাৎ ৭৭ শতাংশ ভারতবাসীর দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা হল ২০ টাকার কম। অথচ সেই বছরই সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যরেখার নিচে ছিল মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ। আসলে দারিদ্র্য কমছে না বাড়ছে, তা মানুষ বোঝে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরকারি তথ্য একেবারেই মেলে না বলে এ সম্পর্কে তাঁদের কোনও বিশ্বাসই নেই।

(তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১১-৫-১১, ইন্ডিয়ান ইকনমি (২০০৭ সংস্করণ) দত্ত ও সুন্দরম, হোমলেস; হ্যাংরি অ্যান্ড অ্যান্টিউসড দ্য স্টেটসম্যান ২০-১-১০)

ত্রিপুরায় সিপিএম পেট্রোপণ্যে বাড়তি কর চাপাল

কেন্দ্রীয় সরকার দাম বাড়ানোর আগেই সিপিএম নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা সরকার পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পেট্রল ডিজেল রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভ্যাট বসিয়েছেন। ত্রিপুরার লাইন গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থা টিএনজিসি এই ট্যাক্স বসানোকে অজুহাত করে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে।

জনবিরোধী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ত্রিপুরাতেও আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি আই (সি)। ৫ মে জি বি বাজারে, ৬ মে দুর্গাচৌমূহনীতে এবং ৭ মে যোগেন্দ্রনগর বাজারে বিক্ষোভ সভায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন দলের ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক, সদস্য কমরেডস সুব্রত চক্রবর্তী, বাবুল বণিক ।

বক্তারা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারেরও তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন, কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছে। ফলে তেল কোম্পানিগুলোর ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে মানুষকে শোষণ করতে আরও সুবিধা হয়েছে। বাস্তবে সরকারের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মালিকদের বিপুল মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেওয়া। বক্তারা দেখান, কীভাবে সব সংসদীয় দলই পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে কাজ করছে। তাঁরা এর বিরুদ্ধে সঠিক নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান।

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের বিশিষ্ট সংগঠক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না লোকাল কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, এলাকার বিশিষ্ট জননেতা কমরেড নকুল জানা দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৫ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কমরেড নকুল জানা ১৯৬৮ সালে তমলুক কলেজে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের ছাত্র সংগঠন ডি এস ও-র কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই যেমন ছাত্র সগংঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান তেমনই কলেজের পড়া শেষে নিজ বাসস্থান এলাকা ময়নায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এলাকার জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একের পর এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যায় বন্যার্তদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর নেতৃত্বে দলের কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। দলের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সংগৃহীত ত্রাণ নিয়ে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ শিবিরগুলো চালানো এবং স্বাস্থ্য শিবিরগুলো সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। একই সাথে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই দাবিতে তাঁর নেতৃত্বে স্থানীয় ও জেলাস্তরে এমনকী ময়নাবাসীর মহাকরণ ও রাজভবন অভিযানের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বছর একটানা আন্দোলন চালিয়ে তিনি দাবি আদায় করেন। এলাকার জল সেচের সমস্যা সমাধানের সফল আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এ ছাড়া সারা রাজ্যে যখন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলন চলেছিল, ময়না থানায় সেই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটাতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। স্থানীয় প্রশাসনের অন্যায়ভাবে খেয়াভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনকারীদের উপর ইজারাদার নিযুক্ত গুণ্ডাদের আক্রমণ ও কমরেড নকুল জানা সহ আন্দোলনের কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা দায়ের করা সত্ত্বেও আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং আন্দোলনের চাপে প্রশাসন খেয়াভাড়া বাড়াতে ব্যর্থ হয়। কায়েমীস্বার্থবাদীদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, শাসকদলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহুবার তাঁকে বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু এ জন্য তিনি প্রতিবাদ থেকে সরে আসেননি। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যখনই মানুষ বিপদে পড়েছে, ছুটে গেছে কমরেড নকুল জানার কাছে, অথবা কেউ তাঁর কাছে না গেলেও তিনিই খবর পেয়ে ছুটে গেছেন এবং সেই সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। ময়নায় অসংখ্য আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দল ও কমরেড নকুল জানার ভূমিকা এলাকাবাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। রাস্তার পাশের গরিব দোকানদার ও গরিব ঝুপড়িবাসীদের উচ্ছেদ করার সরকারি ফরমানের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে উচ্ছেদ বন্ধ করতে কমরেড নকুল জানার নেতৃত্বে দল সফল হয়। এলাকায় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা নিয়েছেন। ময়না থানা এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন এস টি ই এ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। দীর্ঘদিন তিনি এস টি ই এ-র ময়না জোনাল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর যতদিন কর্মক্ষম ছিলেন ততদিন কমরেড জানা সংগঠনের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। যখন শরীর দুর্বল, চলবার শক্তি কমে গেছে তখনও কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে ডেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সমস্ত কমরেডকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। যখন ময়নায় দলের দ্বিতীয় কেউ ছিল না, তিনি একাই সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছেন। যে কোনও যোগাযোগ পেলেই তাঁকে নেতাদের সহায়তায় সক্রিয় কর্মীতে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না। বরং এক্ষেত্রে সফল না হলে নিজের অক্ষমতা নিয়েই ভাবতেন। ছাত্রজীবন শেষে ব্যাঙ্কের চাকরি পেলেও অসচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও ময়নায় সংগঠন গড়ার সুযোগ থাকবে না জেনে তিনি তা নেননি। বন্যা হোক, বা যে কোনও সমস্যা হোক, মানুষ বিপদে পড়েছে জানলে তিনি কোনও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করেই ছুটে যেতেন। এ ছিল তাঁর জীবন যাত্রার ধরন। মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় তিনি পরিবারের ভেতরেও আলোড়ন তুলেছিলেন; কখনও সফল হতে না পারলে, সংকোচে থাকতেন। যে উচ্চ মূল্যবোধগুলি অতীত দিনের বড় মানুষরা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, সেগুলি তিনি আয়ত্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও শিক্ষায় গড়ে ওঠা তাঁর চরিত্র ও আচরণ সকলকেই আকৃষ্ট করত। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর চেয়ে অনেক জুনিয়র কর্মী দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলে তাঁকেই তিনি নেতার মতো মেনেছেন। কোনওদিন ভাবেননি তাঁকে কোন পদে রাখা হয়েছে, কোন কমিটিতে তিনি আছেন। অনেকেই ভাবত তিনি জেলা কমিটির সদস্য। অথচ তিনি যে অনেক জেলা কমিটির সদস্যের চেয়েও বেশি উদ্যোগ নিয়ে জনগণের আন্দোলন গড়ে তুলতেন, নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভালবাসতেন তা জেলা কমিটির সদস্যরাও জানেন। কমরেড নকুল জানাকে কোনও দিন কেউ এনিয়ে কোনও কথা বলতে দেখেনি, বরং কেউ বললে তিনি নিজেই লজ্জিত হয়ে সংকোচে সরে যেতেন। তাঁর মৃত্যুতে এক কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল, দল একজন একনিষ্ঠ সংগঠককে হারাল এবং এলাকাবাসী হারাল এক পরম বন্ধুকে।

১১ মে ময়নায় রবিবারের বাজারে দল আয়োজিত এক মহতী স্মরণসভায় তাঁর বিপ্লবী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর পরিবার-পরিজনের উপস্থিতিতে রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা, কৃষক নেতা ও পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান, দুই মেদিনীপুরের দুই জেলা সম্পাদক কমরেডস দিলীপ মাইতি ও অমল মাইতি উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং থানার বহু শিক্ষক।

কমরেড নকুল জানা লাল সেলাম

শান্তির জল খেয়ে শ্রমিকরা বাঁচবে না অন্ন চাই, বস্ত্র চাই

শিল্পপতি মহল সহ সমাজের উচ্চবিত্তশ্রেণীর একদল মানুষ সাধারণ মানুষকে একথা বোঝাতে চান যে, শিল্পে অশান্তির জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দায়ী। এই অশান্তি বলতে তারা বোঝান উৎপাদন বন্ধ রেখে ধর্মঘট করা, কারখানার চৌহদ্দিতে মিটিং, মিছিল করা, ম্যানেজমেন্টকে ঘেরাও করা ইত্যাদি। তাদের মতে, এর ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আর উৎপাদন ব্যাহত হওয়া তো দেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক। তাই শিল্পে শান্তি বজায় রাখা একটা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। তার জন্য শুরুতেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা দরকার, যাকে তাঁরা বলেন, প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দেওয়া। সম্প্রতি গুজরাটের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে এ কথাই বলেছেন।

শিল্পে শান্তি থাকুক, সকলেই চায়। যেমন সকলেই চায় পরিবারে শান্তি থাকুক। তা সত্ত্বেও সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা সহ নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবারে অশান্তি হয়। এমনকী মারামারি, মামলা মোকদ্দমা, খুন পর্যন্ত হয়ে যায়। পারিবারিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের যে বিরোধ তা থেকেই পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি। তেমনি মালিকের স্বার্থের সঙ্গে শ্রমিকের স্বার্থের যে সহজাতবিরোধ তা থেকেই সৃষ্টি হয় শিল্পে অশান্তি। কেন মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধাত্মক? কারণ শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি না দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে মালিকের স্বার্থ, মালিকের মুনাফা। শ্রমিককে যত বেশি বঞ্চনা করা যায়, মালিকের লাভ হয় তত বেশি। ফলে সব মালিকই চেষ্টা করে সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপায়ে শ্রমিককে সর্বাধিক বঞ্চিত করার। দিনের পর দিন বঞ্চিত, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত অন্নহীন, বস্ত্রহীন, রোগে ওষুধপথ্যহীন শ্রমিকরা কতদিন শান্তির জল খেয়ে বাঁচতে পারে? এই দুঃসহ অবস্থাই শ্রমিককে প্রতিকারের দাবিতে অস্থির করে তোলে। শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়, ঝাণ্ডা তোলে, শোষণের জংলি ব্যবস্থা উৎপাটনের শপথ নেয়। প্রথমে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে মালিকের কাছে দাবিপত্র পেশ করে। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই দাবি উপেক্ষিত থাকে। মালিকের এই উপেক্ষাই শ্রমিকদের ঠেলে দেয় ধর্মঘটের পথে। এটা যদি অশান্তি হয় তা হলে তার জন্য দায়ী কে? শ্রমিক? না মালিক?

মালিকরা শিল্পে কীভাবে শ্রমিকের শান্তি হরণ করে তাদের বাঁচার পথ রুদ্ধ করে দেয় তা এইসব শান্তিবাদীরা বলেন না।

বিজেপি শাসিত রাজ্য ছত্তিশগড়ের কথাই ধরা যাক। এই রাজ্যে সিমেন্ট শিল্প বিখ্যাত। বর্তমানে এই রাজ্যে সিমেন্টের ৯টি বৃহৎ কারখানা এবং ১২টি ছোট কারখানা রয়েছে। বছরে ১৩.৫ মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয় এই রাজ্যে। বাড়িঘর তৈরির ব্যবসা বেড়ে যাওয়ায় আরও সিমেন্টের চাহিদা মেটাতে রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ১০০ মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপাদনের লক্ষে ৩৪টি মৌ স্বাক্ষর করেছে। এই শিল্পে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সিমেন্টের দাম নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের দুই বৃহৎ সিমেন্ট প্রস্তুতকারক সংস্থা — ফ্রান্সের লাফার্জ এবং সুইজারল্যান্ডের হলকিম এ রাজ্যে বহু প্ল্যান্ট কিনে নিয়েছে। এই হলকিম এসিসি (অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি) এবং অম্বুজা গ্রুপকে কিনে নেওয়ার পর এটিই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিমেন্ট প্রস্তুতকারী সংস্থা।

এই শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা কী? অম্বুজা সিমেন্ট প্ল্যান্টের কথাই ধরুন। শ্রমিকদের আজও স্থায়ীকরণ করা হয়নি। চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রমিকরা যে কাজ করছে তার কোনও এ্যাটেন্ডেন্স কার্ড দেওয়া হয়নি, জানানো হয়নি কোন প্রধান মালিক তাদের নিয়োগ কর্তা। কোনও ডকুমেন্ট তাদের দেওয়া হয়নি যার ভিত্তিতে তারা দাবি করতে পারবে তারা অম্বুজা প্ল্যান্টের শ্রমিক। তাদের পিএফ, ইএসআই নেই, নেই বোনাসের সুবিধা। এদের নেই বাঁচার মতো মজুরি। যে-কোনও মুহূর্তে কাজ হারানোর আশঙ্কা সর্বদা এদের তাড়িয়ে বেড়ায়। তাই প্রত্যেকটি সিমেন্ট কারখানায় স্থায়ীকরণের দাবিতে শ্রমিকরা সোচ্চার। ১৯৮৯ সালে শ্রমিকরা গড়ে তুলেছেন প্রগতিশীল সিমেন্ট শ্রমিক সংগঠন। এই সংগঠনের ডাকে ঐ বছর ৫৬ দিন শ্রমিক ধর্মঘট হয়। আন্দোলন চলতেই থাকে। ১৯৯২ সালে ভিলাইয়ের রেল রোকো সত্যাগ্রহ হয়। এতে শিল্পশ্রমিকরাও যোগ দেয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালায়। এসিসি সিমেন্টের তিন শ্রমিক সহ ১৭ জন শিল্পশ্রমিক মারা যায়। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত এসিসি ১২০ জন ক্যাজুয়াল লেবারকে নিয়মিত করে।

আন্দোলনের কাছে এই নীতি স্বীকারকেই মালিকরা বলে অশান্তি। গণআন্দোলনের প্রতি শান্তিপ্রিয় মানুষের মনকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে 'শান্তি তত্ত্বের' ব্যবহার নতুন নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই তত্ত্ব আমদানি করেছিল, যার বিরুদ্ধে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়।" বলেছিলেন 'শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা, প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা মন্ত্রের ঋষি।" তারপর তিনি বলেছেন, "বঞ্চিত পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে — ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল।" এইভাবে ভাবতে অভ্যস্ত করা একটি ভয়ঙ্কর চক্রান্ত। এ হল আন্দোলনকে ভেতর থেকে মারার চেষ্টা। আন্দোলনের মনটাকেই নষ্ট করে দেওয়া। বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতি শোষণের পক্ষে খুবই অনুকূল।

মালিকরা অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে আন্দোলনের চেতনাকেই শুধু মারছে না, গণআন্দোলন দমনে পরিকল্পনামাফিক কোর্টকেও ব্যবহার করছে। ছত্তিশগড়ের রাওয়ান এলাকার কথা বলছি। এই এলাকায় উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় চাষিরা সিমেন্ট শিল্প স্থাপনের বিরোধিতা করেছিল। তখন কোম্পানির পক্ষ থেকে চাষিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, জমি দিলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। ২৫ বছর আগে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩৮ জন চাষির জমি নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ২০ জন নামমাত্র ক্ষতিপূরণ পেলেও বাকিদের তাও দেওয়া হয়নি, চাকরি দেওয়া দুরস্থান। পাঠক, কী বলবেন এই মালিকদের, মহানুভব না প্রবঞ্চক? ফলে রাওয়ান গ্রামে মালিকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছে। এই বিক্ষোভ অগ্নিবলয়ের রূপ নিতে পারে এই আশঙ্কায় মালিকরা ২০ জনের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। তাদের বিরুদ্ধে চার্জ দেওয়া হয়, তারা আশপাশের গ্রামবাসীদের জমি, চাকরি, বেতন ইত্যাদি নিয়ে প্ররোচিত করছে এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছে। কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র! আন্দোলনের আগেই আন্দোলনকারীদের জেলে পাঠানোর কী জঘন্য কৌশল! শান্তিবাদীরা কি এইসব দুষ্কর্ম মেনে নেবেন?

ভুলে যাওয়া চলে না এ দেশটা শ্রেণীবিভক্ত। ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত। উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিপরীত। মালিকশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে মালিকের শান্তির ওকালতি করা নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপির পক্ষে মানায়, মানায় কংগ্রেসকেও। কিন্তু যে শ্রমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'সভ্যতার পিলসুজ', তার ঘরের শান্তি যারা হরণ করে তার বিরুদ্ধে কি দাঁড়াবেন না? নাকি নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন আন্দোলন মানেই অশান্তি, এই গড্ডলিকা প্রবাহে?

উত্তরপ্রদেশে শ্রমিক সমাবেশ

মে দিবসে এ আই ইউ টি ইউ সি-র ডাকে কানপুরে সমাবেশ

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ত্রিপুরায় সভা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৬৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে, দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুরে, পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়ায় এবং কাঞ্চনমালা বাজারে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ এপ্রিল আগরতলায় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সভাপতি, রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, রাজ্যে ২৮ বছরের সিপিএম শাসনে ও পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও বদল ঘটেনি। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সকল জনবিরোধী নীতি এ রাজ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকর করছে সিপিএম। এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সভার প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু বলেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝতে পেরেছিলেন, যেভাবে দেশের স্বাধীনতা আসছে তাতে ধনিকশ্রেণীর হাতে স্বাধীনতার সুফল কুক্ষিগত হবে। তাই গণমুক্তির জন্য স্বাধীন ভারতে একটি সঠিক সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গভীর অনুশীলনের দ্বারা দেখালেন, তৎকালীন অবিভক্ত সিপিআই প্রকৃত সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই ভারতের মাটিতে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল প্রতিষ্ঠা করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে তাঁর সহযোদ্ধাদের নিদারুণ ও কঠোর সংগ্রামে তাঁর জীবদ্দশায় বহু প্রদেশে দলের বিস্তারলাভ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে দলের আরও বিস্তৃতি ঘটে এবং বর্তমানে ২২টি রাজ্যে পার্টি কাজ করছে। প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। তিনি জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবাংলার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মডেলে গণকমিটি গড়ে তুলে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

কোচবিহারে ছাত্র আন্দোলন

সাম্প্রতিক ঝড়ে কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বইপত্র সরবরাহ, ফি মকুব, ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলি অবিলম্বে সংস্কার প্রভৃতি দাবিতে ৪ মে এ আই ডি এস ও কোচবিহার জেলা কমিটির ডাকে ডি আই অফিসে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ।

মূল শত্রু চিহ্নিত না করলে তার পরিণতি ‘আসু’ ও ‘আলফা’ আন্দোলনের মতো হতে বাধ্য

আসামের জনসভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪শে এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি)-র ৬৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আসামের জেলায় জেলায় দলীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন, ব্যাজ পরিধান ও সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল গুয়াহাটির লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যভিত্তিক সমাবেশ। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত জননেতা, দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি। বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী।

২৪শে এপ্রিল পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, এই দিনটি প্রতি বছর পার্টির জীবনে এক নতুন কর্তব্য নিয়ে আসে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশ্ব বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতের পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য দলের নেতা কর্মীরা এই দিন নতুন করে সংকল্প গ্রহণ করেন।

ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্ষমতা দখল ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ তুলে ধরে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, ভারতের মাটিতে একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তুলতে গিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্বাধীনতার কয়েক মাস পরই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, ৫০ বছর ব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত সুফল কুক্ষিগত করেছে জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। জনসাধারণের দেশাত্মবোধকে ব্যবহার করে টাটা বিড়লারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। এরই ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন শোষণের অবসান ঘটলেও জনসাধারণের প্রকৃত শোষণমুক্তি ঘটেনি। কেবলমাত্র স্বাধীনতা অর্জন বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকেই মুক্তি নয়, পুঁজিবাদী শোষণ, মহাজন-জমিদার-জোতদারদের শোষণ এক কথায় মুষ্টিমেয় মানুষ কর্তৃক ৯০ ভাগ মানুষের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি— এটাই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য বা নির্যাস। কিন্তু পুঁজিপতিশ্রেণী জনসাধারণের রাজনৈতিক উপলব্ধির আপেক্ষিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করার ফলেই সেই লক্ষ্য সেদিন অর্জিত হয়নি। দৃঢ়তার সাথে কমরেড শিবদাস ঘোষ সেদিন বলেছিলেন, এর পরিণামে বরং ভারতবর্ষের এই পুঁজিবাদ প্রতিদিন অধিকতর শক্তিশালী এবং সংহত হবে এবং মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ প্রতিদিন আকাশচুম্বী হবে আর তার বিপরীতে জনসংখ্যার ৯০ ভাগ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হবে। একদিকে মুষ্টিমেয় মালিক আর অন্যদিকে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এই বিভাজন প্রতিদিন অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ৯০ ভাগ মানুষ তাদের সমস্ত সম্পদ হারিয়ে সর্বহারা হবে এবং তাদের কাছে জীবন হয়ে উঠবে অভিশপ্ত।

কমরেড শিবদাস ঘোষের এই প্রজ্ঞাদীপ্ত, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, এই অমোঘ সত্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষকে ছাড়া আমরা অন্য কাউকে দেখিনি। বিগত ৬৩ বছর দেশের জনসাধারণ এই সত্যকেই প্রত্যক্ষ করছেন। আজ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ আজ হয় সম্পূর্ণ না হয় প্রায় কর্মহীন। জীবিকা অর্জনের কোনও পথই আজ তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রতিটি গ্রামে অভাব দারিদ্রের তীব্রতা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কৃষকদের অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, কোনও প্রকারে বেঁচে থাকার মতো জমি তাদের হাতে নেই। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি যদি না থাকে এবং উপযুক্ত পরিমাণ উৎপাদন যদি না হয়, তাহলে জীবন নির্বাহ করা যায় না। ফলে কৃষকরা জোতদারদের কাছে জমি বন্ধক রেখে ঋণ করছে এবং সেই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বন্ধক রাখা জমি জলের দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে হাজার হাজার কৃষক কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু শহরেও

কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ এদের কাজ দেওয়ার মতো কলকারখানা সেখানে নেই। যেগুলো ছিল, প্রতিদিন একটার পর একটা বন্ধ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে ইতিমধ্যে ছোট, বড়, মাঝারি ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও যদি বা দু'একটা হচ্ছে তাও উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর। ফলে শ্রমিক নিয়োগের কোনও পথ সেখানে নেই। নিরক্ষর বেকারদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় কায়িক শ্রম। কিন্তু তাও ব্যবহার করার কোনও পথ সামনে নেই। অন্য কোনও উপায় না পেয়ে এম এ, এম এস সি পাশ শিক্ষিত যুবক যুবতী, আজ ৭০০/৮০০ টাকায় নামে 'চাকরি' করছে। এটা তো বন্ডেড লেবারের সমতুল্য। বেঁচে থাকার সংগ্রাম কোন পর্যায়ে গিয়েছে এই ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে ওষুধপত্র প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম আজ জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে। সমগ্র দেশে একই চেহারা। সরকারি হিসাব মতোই জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে। কিন্তু সরকারের এই হিসাবের মধ্যেও কারচুপি আছে। বাস্তব চিত্র হচ্ছে ৭০ শতাংশ মানুষ আজ দারিদ্র সীমার নিচে। এদের দৈনিক উপার্জন মাত্র ২০ টাকা। এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে দৈনিক ২০ টাকা উপার্জন করে ৫/৬ জনের পরিবার পালন হয় কীভাবে? ফলে বেঁচে থাকার পথ না পেয়ে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। গত ৫ বছরে ৩ লক্ষাধিক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এই ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। অভাব দারিদ্রের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মানুষ বিভিন্ন অনৈতিক পথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছে। নারী পাচার আজ একটি মারাত্মক সর্বভারতীয় সমস্যা। পুঁজিপতিশ্রেণীর এজেন্টরা গ্রাম-শহরের হাজার হাজার চূড়ান্ত অসহায় যুবতী মেয়েদের দেশ-বিদেশে দেহ বিক্রির পথে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে বেকারদের এক বিরাট অংশ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কোনও পথ না পেয়ে চোর, ডাকাত, ছিনতাইবাজ হয়ে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এদেরই একাংশকে পুঁজিপতিরা ভাড়াটে বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করে জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে নানান কাজে লাগাচ্ছে, গণআন্দোলন দমনের কাজেও লাগাচ্ছে। অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে হত্যা করাও আজ একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুঁজিবাদ সামাজিক জীবনকে কীভাবে অধঃপতিত করছে সেই প্রসঙ্গে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, মহান কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালেই, যখন পুঁজিবাদ আজকের মতো সংকটগ্রস্ত ছিল না তখনই তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ কেবল যে অর্থনৈতিকভাবেই শোষণ করছে তাই নয়, সমস্ত মানবিক সম্পর্ককে টাকার সম্পর্কে অধঃপতিত করেছে। এ দেশের সামাজিক জীবনে আজ সেটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের শেষটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই। অতীতের যৌথ পরিবারের ধারণা বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে যে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এল তাও আজ ভেঙে যাচ্ছে। মাতা পিতা আজ আর সন্তান-সন্ততির উপর ভরসা রাখেন না, সন্দেহ অবিশ্বাস এখানেও বাসা বেঁধেছে। এমনকী স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রেম প্রীতি ভালবাসা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা দ্রুত বাড়ছে। এমন এক ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে যে — পরিবার মানেই যন্ত্রণা। তাই দেখা যাচ্ছে, মনুষ্যত্ব বজায় রেখে বেঁচে থাকা আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। শুধু অভাব-অনটন-দারিদ্রই নয়, সুকুমার মানবিক বৃত্তিগুলোও আজ সমাজজীবন থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে। এই হচ্ছে একটা দিক। অন্য দিকে এই পুঁজিবাদ শোষিত মানুষের মধ্যে মারাত্মক বিভাজনের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গরিব মানুষকে একে অন্যের বিরুদ্ধে জাত-পাত-ধর্মের নামে উস্কে দিয়ে হয় হত্যা করাচ্ছে, আর না হয় পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের জন্ম দিচ্ছে। জনগণের সীমাহীন দারিদ্রকে ব্যবহার করে পুঁজিপতিশ্রেণী বা তাদের তাঁবেদাররা সর্বত্র গরিব মানুষকে অন্য সম্প্রদায়ের গরিব মানুষের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে, ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করছে। এটাই দেশের বাস্তব চিত্র। পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন ও শোষণের এই যে পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেই সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ঘোষণা করেছিলেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে না পারলে এর পরিবর্তন অসম্ভব। আর সে কাজ নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, একমাত্র বিপ্লবের আঘাতেই সম্ভব।

সংসদীয় রাজনীতিতে নির্বাচনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচন আজ পুঁজিপতিশ্রেণীর কালো টাকার খেলা। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলোও আজ একথা না বলে পারছে না। কংগ্রেস, বিজেপি, এজিপি, এমনকী সি পি আই, সি পি এম — এমন কোনও দল নেই যারা এই কালো টাকার খেলায় যুক্ত হয়নি। আগে মুখ্যত জাত-পাতকে কাজে লাগিয়ে এই দলগুলো নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে জাত-পাতের কার্ড তেমনটা কাজ করছে না। তাই টাকাটাই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণের অভাব দারিদ্র এমন জায়গায় পৌঁছেছে, রাজনৈতিক চেতনাকে, নীতি নৈতিকতাকে এত তলায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচন এখন অসহায় চূড়ান্ত দারিদ্র পীড়িত মানুষের কাছে কিছু উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতটাই অধঃপতিত করা হয়েছে নির্বাচনকে। কমরেড ভট্টাচার্য আরও বলেন, চিন্তাশীল লোকের কাছেও আজ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, নির্বাচন পুঁজিপতিশ্রেণীকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখারই একটা হাতিয়ার। পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের কালো টাকা ও প্রচারযন্ত্রকে ব্যবহার করে এমনভাবে নির্বাচনকে পরিচালনা করছে যাতে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকারী শক্তি জিততে না পারে। তার জন্য একদিকে কোটি কোটি টাকা এবং অন্যদিকে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চলকে কাজে লাগিয়ে এমনকী দরকার হলে ইভিএম মেশিনে কারচুপি করে হলেও পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী শক্তিই 'জিতবে'। এইভাবে যারা পুঁজিপতিশ্রেণীর টাকায় ভোট কিনে এম এল এ হয়ে মন্ত্রী হচ্ছে, দুর্নীতির মাধ্যমে জনসাধারণের সম্পদ চুরি করাই হচ্ছে এদের কাজ। বহু দিন আগে বফর্স কেলেঙ্কারির নায়ক রাজীব গান্ধীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, উন্নয়নের নামে বরাদ্দ এক টাকার ৮৫ পয়সাই দুর্নীতিবাজ নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের পকেটস্থ হয়ে যায়। আই পি এল কেলেঙ্কারি, টুজি কেলেঙ্কারি এগুলো তো সেই হিমশৈলের মতো যার এক ভাগ জলের উপরে আর এগারো ভাগই জলের নিচে। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলিও আজ এ সব একেবারে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। এ রকমই প্রচারের আড়ালে থাকা অসংখ্য দুর্নীতি আজ এক সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশে জনসাধারণের বিক্ষোভ তুষানলের মতো জ্বলছে। এই পটভূমিতেই আন্না হাজারের আন্দোলন আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এতটাই তীব্র যে আন্না হাজারের চার দিনের অনশনকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশই একটা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। আর বিপদ গুনল পুঁজিপতিশ্রেণী। পরিস্থিতি মিশর, টিউনিশিয়া, লিবিয়ার মতো ফেটে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় মানুষের বিক্ষোভকে বিপথে পরিচালিত করার সমস্ত চেষ্টাই তারা করেছে। আন্না হাজারের আন্দোলনের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, ঢালাও প্রচার দিয়ে এমন ধারণাই সৃষ্টি করতে চেয়েছে যে তিনি যেন দ্বিতীয় মহাত্মা আর তাঁর দাবি মানলেই দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে। তাই সরকারেরও আন্না হাজারের দাবি মানতে এতটুকু সময় লাগল না। আন্না হাজারের দাবি সমর্থন করেও আমরা বলেছি যারা উপরোক্ত ধারণা প্রচার করছে, তারা শুধু ভ্রান্ত নয়, তাদের প্রচার অসৎ উদ্দেশ্যেই। কারণ, পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদার দলগুলোই যে দুর্নীতির জন্মদাতা তা ভুললে চলবে না। শুধু আইন করে দুর্নীতি রোধ করা যায় না। দেশে আইন বহু আছে, সেগুলোতে কিছু ভাল ভাল কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাতে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কিছু যায় আসে না। পুঁজিপতিরা যা চায় তাই হয়। আপনারা লক্ষ করুন, দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে যে পুঁজিপতিশ্রেণী তার ক'জন শাস্তি পেয়েছে? কে কাকে শাস্তি দেবে? সরষের মধ্যেই যে ভূত। সম্প্রতি এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে যে টুজি স্পেকট্রামের মতো বিশাল দুর্নীতির গোড়ায় আছে অনিল আম্বানি। তাহলে দেখুন, এই পুঁজিপতিরা কত ধুরন্ধর। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের তীব্র ক্ষোভ আঁচ করতে পেরেই পরিকল্পিতভাবে আন্না হাজারেকে সামনে এনে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কেমন নিখুঁত প্রচেষ্টা। এতৎসত্ত্বেও যে বিষয়টা আমি খুবই গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে এই চূড়ান্ত মানবিক সংকট, মূল্যবোধের সংকট জর্জরিত পরিবেশে তীব্র দারিদ্রে মানুষ প্রতিদিন পিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিবাদী স্পৃহা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। এই ঘটনাটা এটাই আরেকবার নির্দেশ করছে। তাই করণীয় হচ্ছে, জনগণের এই প্রবল প্রতিবাদী মানসিকতাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করে সমস্ত সমস্যার মূল কারণ যে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, তা তাদের ধরিয়ে দেওয়া আর এই পথেই যেভাবে একদিন এই দেশে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাশিয়ার তরুণদের বুকে স্ট্যালিন এখনও জীবিত

১৯৪৫ সালের ৮ মে। মানব ইতিহাসে সর্বাধিক রক্তক্ষয়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল এইদিন, মিত্রশক্তির কাছে ফ্যাসিবাদী জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। এর ঠিক ৩ মাস ২ দিন পরে ফ্যাসিবাদী জাপানও মিত্রশক্তির কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। এর পরেও এক মাসের বেশি সময় ধরে এখানে ওখানে ছোটখাট যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৬ সেপ্টেম্বর হংকং-এ জাপান সম্রাটের আজ্ঞাধীন সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বছরের পর বছর ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে আসছে। পাঠ্য বই, টেলিভিশন, সংবাদমাধ্যম, ফিল্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তারা প্রচার করে আসছে যে, ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও জাপানের কবল থেকে ইউরোপ ও এশিয়াকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিল গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্য কয়েকটি দেশ।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, পোল্যান্ডে আক্রমণের মধ্য দিয়ে জার্মানির ফ্যাসিস্ট হিটলার বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল। বস্তুত ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফ্যাসিস্ট জার্মানি তার সেনাবাহিনীর অধিকাংশকেই মোতায়েন করেছিল পূর্ব রণাঙ্গণে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল গণহত্যা চালিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তছনছ করে দেওয়ার। ফ্যাসিস্ট নাৎসিবাহিনীর সবচেয়ে সেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদল, সাঁজোয়াবাহিনী, গোলন্দাজবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান অংশ, বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং ফ্যাসিবাদী অন্ধ চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন নরহত্যাকারী বাহিনীর অধিকাংশকেই সোভিয়েতের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করার ও সেদেশের জনসাধারণকে হত্যা করার জন্য পূর্ব সীমান্তে নিয়োজিত করা হয়েছিল। লালফৌজ ও সোভিয়েত জনগণের অতুলনীয় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম (১৯৪১-'৪৫) সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের মাটিতে যেমন ফ্যাসিস্ট হিটলার বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল তেমনি পিছু ধাওয়া করে জার্মানির মাটিতেও তাদের পরাস্ত করেছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ব রণাঙ্গনকে কিছুটা চাপমুক্ত করতে জার্মানি অধিকৃত পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য আমেরিকা ও ব্রিটেনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বারবার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই অনুরোধে তারা কর্ণপাত করেনি।

ব্রিটেন ও আমেরিকা চেয়েছিল যাতে নৃশংস নাৎসিবাহিনীর হাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিধ্বস্ত হয়। তাদের আশা ছিল, তা করতে গিয়ে নাৎসিবাহিনী নিজেও পর্যুদস্ত হবে এবং তারপরেই ব্রিটেন ও আমেরিকা সহজেই ফ্যাসিস্ট বাহিনী অধিকৃত ইউরোপকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবে। কিন্তু তাদের সে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গিয়ে যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সোভিয়েত বাহিনীর বীরত্বের কাছে নাৎসিরাই বরং হার মানছে, তখন বাধ্য হয়ে ব্রিটেন-আমেরিকা 'ডি-ডে' অর্থাৎ পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু করার দিন ঘোষণা করেছিল। ফলে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে বস্তুত একাই লড়তে হয়েছিল বর্বর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে। যুদ্ধে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেরই ৮৮ লক্ষ সেনা এবং ১ কোটি ৪৬ লক্ষ সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিল। এর সঙ্গে আহতদের যোগ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নৃশংস নাৎসি বাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিল, গোটা বিশ্বকে রক্ষা করেছিল ভয়ানক ফ্যাসিবাদের কবল থেকে। যুদ্ধে এত ক্ষয়ক্ষতি বিশ্বের আর কোনও দেশকেই সহ্য করতে হয়নি। অধিকৃত ইউরোপ থেকে জার্মানিকে হঠানোর কাজটিও মূলত করেছিল কমিউনিস্ট প্রতিরোধ যোদ্ধারাই। ব্রিটিশ বা মার্কিন সেনারা নয়।

সেই থেকে ৮ মে দিনটি গোটা বিশ্ব জুড়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী বিজয় দিবস হিসাবে পালন করেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। এই দিন তাঁরা স্মরণ করেন ফ্যাসিস্ট হিটলারবাহিনীর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের

আটের পাতায় দেখুন

জার্মান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় দিবসে ৮ মে মস্কোর রেড স্কোয়ারে স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে যুবকদের মিছিল

কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তানকে শুভেচ্ছাবার্তা

একের পাতার পর

কিন্তু কমরেডস্, আজকের দিনে একটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, বিশেষ করে রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের পতনের পর এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংকটের দিনে। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান পতাকা ও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মার্কসবাদী হিসাবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অভাবনীয় মাত্রার এই বিপর্যয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কয়েকটি দেশে বিপ্লবের বিজয় এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের গৌরবময় অগ্রগতি ঘটলেও সংকট যে দেখা দিল, তার কারণ, জীবনের নানা নতুন নতুন প্রশ্নের সামনে ও সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদের অগ্রগতি ঘটানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, আদর্শগত-সংস্কৃতিগত মানের নিম্নগামিতা, আন্দোলনের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের পরিবর্তে মূলত যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা, নতুন রূপে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের আত্মপ্রকাশ প্রভৃতি, যার সামগ্রিক পরিণামই জন্ম দিল আধুনিক সংশোধনবাদের। মহান স্ট্যালিন, যিনি লেনিন পরবর্তী সময়ে ছিলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অথরিটি, তাঁকে মসীলিপ্ত করার মধ্য দিয়ে রেনিগেড ক্রুশ্চেভ অধঃপতনের প্রক্রিয়া শুরু করেন, যার চূড়ান্ত পরিণামেই রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লব ঘটল। চীনেও এই একই অপকর্মটি করেন পুঁজিবাদী পথের অনুসারী লিউ শাও চি - তেংশিয়াও পিঙ চক্র।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই যে, এ যুগের অন্যতম অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, আমাদের দল গঠনের সময়েই, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নত উপলব্ধির আধারে নেতা ও কর্মীদের নিরন্তর আদর্শ ও সংস্কৃতি চর্চার অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি উন্নততর কমিউনিস্ট সংস্কৃতি অর্জনের উপর জোর দিয়েছেন — যে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও ব্যক্তিবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যা কেবলমাত্র অর্জন করা যায় শুধু ব্যক্তিসম্পত্তি থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারা নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। তিনি দেখান যে, পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কেবল তাঁদের নিয়েই গঠিত হওয়া দরকার যাঁরা নিজেদের জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে তীব্র সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থকে শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব এবং পার্টির স্বার্থের সঙ্গে বিলীন করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। দলের অভ্যন্তরে দলের সমস্ত সদস্যদের যুক্ত করে এই সংগ্রামকে জীবন্ত রাখতে হবে, একই সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, যাতে দলের মধ্যে সমচিন্তাপদ্ধতি, সমচিন্তা, সমদৃষ্টিভঙ্গি, সমউদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে উঠতে পারে। এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় আদর্শগত কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে যখন দলের মধ্যে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে ওঠে এবং যৌথ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট মূর্ত অভিব্যক্তি দলের সর্বোচ্চ বডির কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, কেবলমাত্র তখনই একটি দল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অর্জন করে, যা একটি লেনিনবাদী দলের মূলনীতি। আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে লড়াই না করে ও তাকে পরাস্ত না করে আজকের কমিউনিস্ট আন্দোলন এগোতে এবং জয়যুক্ত হতে পারবে না।

কমরেডস, আমরা বুঝি, কী নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পাকিস্তানের মাটিতে আপনারা দল এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলছেন। কিন্তু আপনারাও জানেন যে, শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার ইতিহাসে কোথাও বিপ্লব কদাপি অনুকূল পরিস্থিতিতে বিকশিত ও জয়ী হয়নি। বরং ইতিহাস দেখায় যে, প্রতিটি যুগে প্রতিটি দেশে প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করেই বিপ্লব গড়ে উঠেছে এবং জয়ী হয়েছে। সর্বত্রই এই প্রতিকূল পরিস্থিতি বিপ্লবীদের আরও পোড় খাওয়া ও ইস্পাতদৃঢ় করেছে। আপনাদের এই কঠিন দিনে আমরা অবশ্যই আপনাদের পাশে আছি। আপনাদের এই সংগ্রামের কথা অন্যান্য দেশের প্রকৃত কমিউনিস্টরা যখন জানবেন, নিঃসন্দেহে তাঁরাও আপনাদের পাশে দাঁড়াবেন।

আজ মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক — সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সংকটের জন্ম দিয়েছে। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের এই সংকটের সমাধান এই পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় অসম্ভব। ঐতিহাসিকভাবে এই সংকটের সমাধান একমাত্র পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক পথেই সম্ভব, যা সচেতন সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীই কেবল সুনিশ্চিত করতে পারে।

বিভ্রান্তি এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থা কাটিয়ে বিশ্বে আবার শ্রমিক শ্রেণী মাথা তুলছে। তাদের আন্দোলন অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে চলেছে। এমনকী অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বত্র শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের আওয়াজ উঠেছে। বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা তৈরি, বর্তমান সময়ের প্রয়োজন হল ভাবগত শর্ত পূরণ করা, অর্থাৎ দেশে দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অস্ত্রে বলীয়ান, শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অভ্যুদয় ঘটানো। আমরা আশা করি, এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট সচেতনতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে ও গতিবেগ পাবে এবং বিপ্লবী আন্দোলন মাথা তুলবে ও শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হবে।

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই সংকটের দিনে সমস্ত দেশের প্রকৃত কমিউনিস্টদের প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। আমরা ভালো ভাবে জানি যে, পাকিস্তান ও ভারতের জনগণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের একই ঐতিহ্যের অধিকারী। আমরা ঐকান্তিকভাবে আশা করি, ভারত ও পাকিস্তানের শ্রমিকশ্রেণী ও সকল শোষিত জনগণ দুই দেশের শাসকশ্রেণীর সকল বাধা ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পরাস্ত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে সংহত এবং ঐক্যকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাবে। কমরেডস, আমরা আবারও আপনাদের পার্টি কংগ্রেসের সকল প্রতিনিধির প্রতি আমাদের আন্তরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এর পূর্ণ সাফল্য কামনা করছি।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তরে কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তানের অভিনন্দন বার্তা

কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান-এর অষ্টম কংগ্রেস উপলক্ষে যে উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ, সুগভীর প্রজ্ঞাদীপ্ত এবং মার্কসবাদী চিন্তাসমৃদ্ধ শুভেচ্ছা বার্তা আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা তার উচ্চ সমাদর করছি, আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক, জটিল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন সাম্রাজ্যবাদ ও তার বহু রঙের দোসরদের খুনী বাহিনী আমাদের কমিউনিস্টদের পুরোপুরি খতম করে দিতে চাইছে, তখন আপনার এই সংহতি এবং অভিনন্দন পত্র আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা ও শক্তির বিরাট উৎস এবং শ্বাসরোধকারী ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অক্সিজেন স্বরূপ। আপনাকে কমরেডসুলভ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের আরও অগ্রগতি প্রত্যাশা করছি।

ইমদাদ কাজী
ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি
কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান

(উল্লেখ্য, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্বাচিত রচনাবলীর প্রথম খণ্ড সি ডি মারফত পড়ে কমরেড ইমদাদ কাজী জানিয়েছেন, তাঁরা প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ বোধ করছেন। মহান নেতার অন্যান্য রচনা সত্বর পাঠানোর জন্য তাঁরা অনুরোধ করেছেন এবং কিছু রচনা অন্যান্যদের পড়ানোর জন্য নিজেরা উর্দুভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছেন।)

আসামের জনসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের ভাষণ

চারের পাতার পর

ঐক্যবদ্ধ গণঅভ্যুত্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শোষণ শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল, সেই ভাবেই পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন শোষণের অবসানের জন্য শোষিত জনগণের গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত করার পথে পরিচালনা করা।

এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের দায়িত্ব আজ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উপরেই বর্তেছে এটা উল্লেখ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বাইরে কোনও দলই এই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না। বুর্জোয়া দলগুলোর কথা বাদই দিন, কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই, সিপিএম-ও আজ পুঁজিবাদের কেনা গোলাম। এদের নেতারা আজ পুঁজিবাদ শব্দটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে চান না। এমনকী অবিভক্ত সিপিআই ভাঙতে ভাঙতে সর্বশেষ মাওবাদী নামে যে অংশ বেরিয়ে এসেছে তারা পর্যন্ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করে না। কেন এই বিস্ফোরক বেকার সমস্যা, এই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, কেন কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, কেন শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে, এই সবের মূল কারণ যে পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম শোষণের ফলে সৃষ্ট পুঁজিবাদী বাজার সংকট, একথা অর্থনীতির ছাত্র মাত্রই জানে। অথচ মূল শত্রু পুঁজিপতিশ্রেণীকে টার্গেট করা দূরে থাক বরং এরা সকলেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রকে কাল্পনিক শত্রু হিসাবে খাড়া করে কার্যত পুঁজিপতিশ্রেণীকে জনসাধারণের ক্ষোভ থেকে আড়াল করছে। আপনারা লক্ষ করছেন, পুঁজিপতিশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় সিপিএম-সিপিআই-এর উচ্চ প্রশংসা। মাওবাদীদের প্রচার দিতেও পুঁজিপতিশ্রেণীর আপত্তি নেই। আর আমরা কলকাতা বা দিল্লি মহানগরীতে এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ করলেও পত্র-পত্রিকায় খবরের জন্য এক ইঞ্চি জায়গা হয় না। এর নিগূঢ় কারণ ধরিয়ে দিতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদার দলগুলো ঠিকই চিহ্নিত করেছে যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ভিতরেই নিহিত রয়েছে তাদের মৃত্যুবাণ। তাই লক্ষ করুন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে রুখতে মাওবাদীদের প্রচার দিয়ে প্রতিবাদী যুবক-যুবতীদের ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টাও তারা অহর্নিশ করছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জী আমাদের দুটোর বেশি আসন ছাড়তে রাজি হয়নি। অথচ এই দুটো আসনই দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দখলে তাই পশ্চিমবঙ্গে সকল মানুষই বুঝেছেন এই 'ছাড়া' অর্থহীন। গত লোকসভা নির্বাচনে যখন তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র একটা আসন আমাদের ছাড়ল তখন আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ মমতা ব্যানার্জীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা বলুন তো, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দলের প্রভাব যা তাতে কি আপনাদের মতে একটি আসনই আমাদের প্রাপ্য? তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী একটু বিব্রত হয়েই বলেছিলেন — কিছু মনে করবেন না, বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষতিপূরণ করে দেব। মমতার তখনকার এই কথায় ধূর্ততা ছিল তা বলা যাবে না। কিন্তু আসন বণ্টন নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগেই হঠাৎ আমাদের দুটো আসন দেওয়ার কথা তাঁরা ঘোষণা করে দিলেন। কেন এই অদ্ভুত আচরণ? চিন্তাশীল কোনও মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এর পিছনে কাজ করছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস, কর্পোরেট হাউস এবং ব্যুরোক্রেসির সম্মিলিত চাপ — এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর শক্তি বৃদ্ধি করা চলবে না। এই দু'একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, এইগুলিও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে, আমাদের দলের বাইরে অন্য সমস্ত দলই আজ পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে। এই পরিস্থিতিতেই দৃঢ়তার সাথে আমি বলতে চাই, বিপ্লবই নির্বাচনের একমাত্র বিকল্প— কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে, রুচি-সংস্কৃতিগতভাবে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা এবং এরই অপরিহার্য শর্ত হিসাবে প্রতিনিয়ত তাদের পাশে থেকে তাদের ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এই পথে তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ঐতিহাসিক কর্তব্য আজ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উপরই বর্তেছে।

আসামের জটিল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, অন্যান্য রাজ্যে কৃষির উন্নয়ন যতটুকু হয়েছে, সেচ ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার যতটুকু হয়েছে আসামে তাও হয়নি। বিগত ৬৩ বছরে ২/৩টি তেল শোধনাগার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও শিল্প এখানে গড়ে ওঠেনি, বরং যে দু-একটা ছিল ইতিমধ্যে সেগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চা-শিল্পের অবস্থাও খুবই সংকটজনক। ফলে জনসাধারণের জীবনজীবিকার মান ক্রমাগত নিচে নামছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিতরেও বিরোধী পক্ষের দাবিদাওয়া, আন্দোলনের চাপে সরকার যেটুকু কাজ করতে বাধ্য হয়, আসামে সে অবস্থা আজ দীর্ঘদিন থেকে নেই। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনও আন্দোলন এখানে গড়ে তোলা যাচ্ছে না। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী, চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক জাতি বিদ্বেষ প্রসূত এই পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ — এদের মধ্যে সামান্যতম বাহ্যিক পার্থক্যও চোখে পড়ছে না। উভয় পক্ষেরই হাতিয়ার উগ্র প্রাদেশিকতা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। এই জঘন্য রাজনীতি কে কত বেশি করতে পারে তা নিয়েই এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। মূল্যবৃদ্ধি কিংবা বেকার সমস্যা যাই হোক না কেন কোনও দলেরই এসবে কোনও গরজ নেই। এখানে নামে কয়েকটা পার্টি থাকলেও সবকটাই উগ্র প্রাদেশিকতাবাদের দ্বারা চালিত এবং সকলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর গোলাম। অসমীয়াদের 'অস্তিত্ব বিপন্ন' এই ধূয়া তুলে অসমীয়া ভাষী মানুষের দুর্বলতার সুয়োগ নিয়ে জনগণের টাকা চুরি করাই এইসব রাজনৈতিক দলগুলোর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদবিরোধী চেতনা গড়ে তোলার কাজ মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন যতটা গড়ে তোলা যাচ্ছে তা এখানে কঠিন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। 'আমরা অসমীয়া ভাষীরা শোষিত, ভারতীয়রা আমাদের শোষণ করছে, তাই আসামকে স্বাধীন করতে হবে' — এই চিন্তার ভিত্তিতেই আলফা আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলন খুব দুর্বল ছিল বলা যাবে না। কারণ এটা দমন করার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে পর্যন্ত নিয়োগ করতে হয়েছে এবং ১০/১২ হাজার যুবক এই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই আন্দোলনের পরিণতি কী হল? জনজীবনে কী মঙ্গল নিয়ে এল? আলফা আন্দোলন শুরু হওয়ার মুহূর্তে তার সর্বনাশা পরিণতি, ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য আমরা নানা রকম প্রচেষ্টা চালিয়েছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। জনতা দলের প্রথম সারির নেতা বিশ্ব গোস্বামী থেকে শুরু করে পিটিসি-র সমর ব্রহ্ম চৌধুরী প্রমুখ সকল বড় বড় নেতাদের বার বার বলেছি — আপনারা এই আন্দোলনের ভ্রান্ত তত্ত্ব, অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা এবং তার মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে অসমীয়া ভাষী জনসাধারণকে সচেতন করুন। আপনাদের এই সতর্কবাণী আরও কার্যকর হবে, অসমীয়া ভাষী মানুষকে আরও বেশি করে ভাবাবে। মুখে বিরোধিতা না করলেও সেদিন তাঁরা আমাদের সেই আবেদনে সাড়া দেননি। মার্কসবাদের ছাত্র হিসাবে অবস্থা নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা বলেছিলাম, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত এই আন্দোলন কেবল বৃথা রক্তপাতই ঘটাবে। নাগাল্যান্ড, মিজোরামের অভিজ্ঞতা তাই দেখিয়েছে। মাও সে-তুঙকে উদ্ধৃত করে সেদিন আমরা দেখিয়েছিলাম যে, কোনও আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন অর্থাৎ শত্রু মিত্র নির্ণয়ে যদি এতটুকু ভুল হয় তাহলে শুরুতে সেই আন্দোলনের যতই ক্ষমতা থাক, যতই আত্মত্যাগ হোক সে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই পুঁজিপতিশ্রেণীকে মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত না করে শুধু ভারত থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলে শুরু হওয়া আলফার এই সংগ্রাম অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হবে। দ্বিতীয়ত বলেছিলাম, আসাম ঐতিহাসিকভাবে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষই এই ধারণা পোষণ করেন। অভাব-দারিদ্র-বঞ্চনা-শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করতে চান, কিন্তু ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না। আমরা পুস্তক প্রকাশ করে আলফার নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলাম যে, আপনাদের বিশ্লেষণ ঠিক নয়, আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয়া ভাষী মানুষের সমর্থন পাবেন না। ফলে যারা স্বাধীনতার সমর্থন করে না, তাদের সমর্থন নিয়ে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনারা তাকে প্রতিহত করতে পারবেন না। ফলে আপনাদের সংগ্রামের লাইন পুনর্বিবেচনা করুন। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, আসামের জনগণকে সেদিন আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, ব্যর্থতার মুখে এই আন্দোলনের নেতারা একদিন আপস করতে বাধ্য হবে। কারণ শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ওরা বিপ্লবী নয়। আজকের দিনে প্রকৃত আপসহীন বিপ্লবী যোদ্ধা হচ্ছে মার্কসবাদে যাদের প্রকৃত বিশ্বাস আছে, যারা মার্কসবাদের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। '৭০-এর দশকে গড়ে ওঠা নকশাল আন্দোলনেরও একই পরিণতি ঘটেছিল। একমাত্র হতাশা ছাড়া নকশাল আন্দোলন অন্য কিছু দিতে পারেনি। আলফা আন্দোলনও একই পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আজ সেটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ৩০ বছর পর আজ আলফার সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়া স্বীকার করেছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। অসমীয়া ভাষী মানুষ তাঁদের সমর্থন করেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। একতরফা মার খেয়ে, ব্যর্থতার গ্লানিতে অসমীয়া ভাষী জনসাধারণ আজ আন্দোলন শব্দ শুনলেই খেপে উঠছেন। এই পরিস্থিতিতে, প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলন এক কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমরা আন্দোলনের শুরুর দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারেনি সিপিআই, সিপিএম, বুঝতে পারেনি এই আন্দোলনের যারা হোতা, বুঝতে পারেনি এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। তাই ১২ হাজার ব্যর্থ প্রাণদানের পর আজ তাদের ভুল ভেঙেছে। এর খেসারত আলফার নেতৃবৃন্দকে দিতে হবে, যেমনটা হিটলারকেও দিতে হয়েছে। ইতিহাসের জবাবদিহির সম্মুখীন তাদের হতেই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা মহান দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এটা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হয়ে, পুঁজিবাদকে মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত না করে, যে কোনও সংগ্রাম — মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধেই হোক, বেকার সমস্যার বিরুদ্ধেই হোক কিংবা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রাস্তাঘাটের দাবিতেই হোক — তার পরিণতি 'আসু আন্দোলন', 'আলফা আন্দোলনের' মতোই হতে বাধ্য। বৃথা রক্তপাত হতে পারে, প্রতিবাদী যুবক-যুবতীর বৃথা প্রাণদান হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পরিবর্তন আসতে পারে না। এই সত্যকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আসামের মাটিতে আজ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সমাবেশের বিশিষ্ট বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল দল গড়ে তুলতে গিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, ততদিন শোষণ নির্যাতন অব্যাহত থাকবে। এটাই ভবিতব্য। ফলে প্রকৃত মুক্তির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা, আর তার জন্য প্রয়োজন জনগণের ঐক্য। কিন্তু এই রাজ্যে জনসাধারণের ঐক্য গড়ে ওঠার পরিবর্তে তা প্রতিদিন ভেঙে চুরমার হচ্ছে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর পৃথক অস্তিত্বরক্ষার ভ্রান্ত ধারণার ফলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা আজ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার চর্চার মধ্য দিয়ে।

সভাপতি কমরেড ভূপেন্দ্রনাথ কাকতি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

সাত মাসেও ফল প্রকাশ হয়নি

তীব্র প্রতিক্রিয়া ডিএসও-র

"রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষা বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের হাজার হাজার টাকা ফি বাবদ নেওয়া হচ্ছে অথচ পরীক্ষার সাত মাস পরেও পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরোয়নি। এদিকে আগামী ডিসেম্বরেই পার্ট-টু পরীক্ষা। কর্তৃপক্ষের এ হেন উদাসীনতায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন অন্ধকারে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও। ১৯ মে সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড ইমতিয়াজ আলম এক প্রেস বিবৃতিতে এ কথা জানিয়ে বলেন, আমরা অবিলম্বে পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি।

সংগ্রহ করুন

বাবরি মসজিদ বিতর্ক

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়

বিচারের প্রহসন

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

কংগ্রেস-বিজেপির নেতৃত্বে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন এগোতে পারে না

ঘটনাস্থল — মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলা। সময়টা — নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ। সেখানে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এনরন কোম্পানির দাভোল পাওয়ার প্রজেক্টের বিরুদ্ধে। কারণ, এই প্রজেক্টের জন্য হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদের মুখে পড়েছিলেন। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস-এনসিপি জোট সরকার কোনও পুনর্বাসন ছাড়াই এই কোম্পানির স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জীবন-জীবিকা বাঁচাতে এলাকার মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। এই আন্দোলনের একটা পর্যায়ে বিজেপি যোগ দেয়। এবং জনসাধারণও বিশ্বাস করে আন্দোলনের নেতৃত্ব বিজেপির হাতে ছেড়ে দেয়। বিজেপি বক্তৃতায় নিজেদেরকে জনগণের ত্রাতা হিসাবে তুলে ধরে। এই আন্দোলনের ধারায় ১৯৯৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস-এনসিপি জোটের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং জনজোয়ারে ক্ষমতাসীন হয় বিজেপি-শিবসেনা জোট। কিন্তু কী দেখা গেল তারপর? দেখা গেল, আন্দোলনের সময় যে বিজেপির স্লোগান ছিল 'প্রোজেক্ট হটাও', ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেই বিজেপি এক বছরের মধ্যে নাটকীয়ভাবে ঘুরে যায় এবং দাভোল প্রোজেক্টের কোম্পানির সঙ্গে নতুন চুক্তি করে, যাতে তা বাস্তবায়িত করা যায়। এই হল বিজেপি। এই হল গণআন্দোলনের প্রতি তার নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা।

এহেন বিজেপি এবারও ঢুকে পড়েছে মহারাষ্ট্রের জইতাপুরে এবং উত্তরপ্রদেশের ভাট্টা-পারসোল গ্রামে।

জইতাপুরে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সহায়তায় ফ্রান্সের অরিভা কোম্পানি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে তৎপর। পরমাণু কেন্দ্রের বিপদ মানুষ দেখেছে রাশিয়ার চের্নোবিলে, জাপানের ফুকুসিমায়। বিস্ফোরণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, কোটি কোটি মানুষের তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত হওয়ার বিপদ এই শিল্পের অনুষঙ্গ। এছাড়া রয়েছে কৃষিক্ষেত্র দূষিত হওয়া, ফসল নষ্ট হওয়া, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গরম জল সাগরে ফেলার জন্য জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলজ প্রাণীদের মৃত্যু, প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার বিপদ। ফলে এই কেন্দ্র করতে দিলে যে শেষ পর্যন্ত যে গণচিতা তৈরি হবে এটা বুঝতে পেরে জইতাপুরের মানুষ আন্দোলনে সোচ্চার। কিন্তু জইতাপুরের মানুষ কি সচেতন বিজেপির উপস্থিতি নিয়ে? জইতাপুরের জনগণ যদি অবিলম্বে সতর্ক না হোন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি বিজেপির হাতে ছেড়ে দেন, তাহলে এর পরিণতি এনরনের মতো হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, বিজেপি ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির কট্টর সমর্থক। তারা চেষ্টা করবে যেকোনভাবেই হোক এই চুক্তিকে কার্যকর করার। আর তা করার জন্য আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে প্রয়োজন হল জনগণের সক্রিয় নজরদারি। মনে রাখা দরকার, বিজেপি ভারতের শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দু'নম্বর জাতীয় দল। এরা গণআন্দোলনের শক্তি কোনওকালেই ছিল না। গণআন্দোলন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে যে ঐক্য দাবি করে, বিজেপির জাতি ধর্ম বর্ণবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সেই ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করে। এরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী শক্তি। ভোটের স্বার্থে আন্দোলনের ভান কখনও কখনও এরা হয়তো করে, কিন্তু কখনই এরা মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে বেশিদূর এগোতে দেয় না। তার আগেই আপস করে আন্দোলনকে অর্ধপথে নষ্ট করে দেয়। এই বিজেপি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সরকারের অন্যতম শরিক। এই মোর্চা সরকার রাঁচি ধানবাদ সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে। ক্ষমতায় থাকলে উচ্ছেদ করা, আর ক্ষমতায় না থাকলে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আন্দোলন খেলা করা এই হল বিজেপির চরিত্র।

ফলে এদের চরিত্র সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করতে না পারলে এরা জনতার বন্ধু সেজে আন্দোলনে ঢুকে আন্দোলনকেই বিপথগামী করবে।

একই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার কংগ্রেস সম্পর্কেও। পুঁজিপতিশ্রেণীর অন্যতম বিশ্বস্ত এই দলটি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ায়নি। নন্দীগ্রামে এত খুন ধর্ষণ হলেও, সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে পুড়িয়ে মারা হলেও কংগ্রেস ছিল একেবারে স্পিকটি নট। কারণ, কংগ্রেসের 'সেজ'নীতিই এখানে কার্যকর করছিল সিপিএম। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের অন্যতম একটি সংস্থা বিসিসিএল ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে। এসবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোনও প্রতিবাদ শুধু নেই তা নয়, বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের মদত না থাকলে এভাবে উচ্ছেদ চালাতে পারতো না। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস নিজেই উচ্ছেদের অন্যতম হোতা। এই কংগ্রেস স্বাধীনতার সাড়ে ছয় দশকেও সুষ্ঠু জনমুখী পুনর্বাসন নীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, উচ্ছেদের মুখে পড়া মানুষের প্রতি তাদের কী নিষ্ঠুর অবহেলা! এই কংগ্রেসের তরুণ নেতা রাহুল গান্ধী সম্প্রতি ছুটে গেলেন উত্তরপ্রদেশের ভাট্টাপারসোল গ্রামে, যেখানে মায়াবতী সরকার গুলি চালিয়ে ৩ জন কৃষককে হত্যা করেছে। সংবাদমাধ্যমগুলি রাহুল গান্ধীকে কৃষক বন্ধু হিসাবে ব্যাপক প্রচার দিচ্ছে। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত এই দলটি কৃষকদরদের যে ভেক ধারণ করেছে তা কপটতাপূর্ণ। সামনে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে ফয়দা তোলাই তার উদ্দেশ্য। কৃষকস্বার্থে আন্দোলন করা কংগ্রেসের ঐতিহ্য নয়। আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষ সক্রিয় হোক, নেতৃত্ব দিক এটা কংগ্রেস চায় না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় কৃষক আন্দোলনে জল ঢেলে দিয়েছিল তদানীন্তন কংগ্রেস, যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন নেহেরু, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। এরা ততটুকুই আন্দোলনের ভান করবে, যতটুকু ভোট পাওয়া ও ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য দরকার। ফলে সত্যিকারের আন্দোলন এদের দ্বারা হতে পারে না।

আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে চাই সংগ্রামী বামপন্থী নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন, সিঙ্গুরে-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ছিল বলেই এই আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিতে পেরেছিল। এস ইউ সি আই (সি) ভোটের সংকীর্ণ স্বার্থে গণআন্দোলন করে না। তার গণআন্দোলনের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ মানুষকে লড়াইয়ের কলাকৌশল দেখানো, যাতে তারা নিজেরাই শত্রুর আক্রমণ বুঝতে পারে এবং মোকাবিলা করতে পারে। কংগ্রেস, বিজেপির মতো কোনও বুর্জোয়া দল এটা চাইতে পারে না। তারা জনগণকে চিরকাল নিষ্ক্রিয় করেই রাখতে চায়। বিপরীতে যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) চায় জনগণের সক্রিয় ভূমিকা। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড — সর্বত্রই এস ইউ সি আই (সি) সাধ্য মতো আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি এই মূল কথাটা জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

(তথ্য সূত্র ঃ ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ৩০ এপ্রিল-৬ মে, ২০১১)

গাববেড়িয়া পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন নিয়ে

মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ

'বর্তমান' ও দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ১১ মে প্রকাশিত এক ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার সে দিনই এক বিবৃতিতে বলেন,

''মন্দিরবাজার থানার গাববেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন প্রসঙ্গে বর্তমান ও দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সঠিক নয়।'' প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ''বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-টি এম সি জোট গড়ে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে লড়া হয়। নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি)-র ৫ জন, টি এম সি-র ৩ জন, জোট সমর্থিত ২ জন নির্দল ও সি পি এম-এর ২ জন — মোট ১২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এস ইউ সি আই (সি) -র নারায়ণ সরদার এবং টি এম সি-র আনন্দ হালদার যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যক্তিগত কারণে নারায়ণ সরদার প্রধান পদে ইস্তফা দিলে এস ইউ সি আই (সি) দলের ফাল্গুনী চৌধুরীকে প্রধান পদে প্রার্থী করা হবে এই সিদ্ধান্ত জোটের সকল পঞ্চায়েত সদস্য এবং টি এম সি-র স্থানীয় নেতৃত্বকে জানানো হয়। ১০ মে প্রধান নির্বাচনের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের ফাল্গুনী চৌধুরীর নাম প্রধান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়। অন্য কোনও প্রার্থী না থাকায় ফাল্গুনী চৌধুরী প্রধান নির্বাচিত হন। উল্লেখ করা দরকার, নারায়ণ সরদার টি এম সি দলের সদস্য নন। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা দেওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এই নির্বাচনে সিপিএম-এর সমর্থন নেওয়া বা টিএমসি-র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মিথ্যা। বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার প্রাক্কালে এই ধরনের সংবাদ জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। সেজন্য ১১ মে প্রকাশিত সংবাদ সংশোধন করে ১২ মে আপনার সংবাদপত্রে সঠিক তথ্য প্রকাশের জন্য এই বিবৃতি পাঠালাম।''

দলের প্রবীণ কর্মীর জীবনাবসান

দমদম-বাগুইআটি অঞ্চলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড অনিমা কর্মকার গত ১৫ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিউ লাইফ নার্সিং হোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মী তাঁর পুত্রদের আচার-আচরণ ও কাজকর্মই কমরেড অনিমা কর্মকারকে দলের প্রতি, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৮০-র দশকে তিনি দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী হিসাবে সাধ্যমত এলাকায় কাজ শুরু করেন।

সচ্ছল পরিবারের সংসারী মহিলা হয়েও এবং ধর্মীয় সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তিনি দলের বিপ্লবী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে ধর্মীয় সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত হন। পার্টির সংস্কৃতিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল এবং তিনিও জীবনে পার্টিকে সেভাবেই নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, পার্টি কর্মীদের তিনি 'মা'। তাঁর বাড়িতে কোনও কর্মী গেলে, না খেয়ে আসার তার উপায় ছিল না। তিনি মনে করতেন, মায়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করাই তাঁর প্রধান কাজ। নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য তিনি এলাকার যুবক-যুবতী ও প্রতিবেশীদের সকলের প্রিয় ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন 'মাসিমা' হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দলের আবেদনকারী সদস্য না পূর্ণ সদস্য তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র ভাবনা ছিল না। যতদিন সক্ষম ছিলেন, দলের কোনও মিটিংয়ে তাঁর কখনও অনুপস্থিতি ঘটেনি।

কমরেড অনিমা কর্মকারের মৃত্যু সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াত কমরেডের প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধায় দলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। দমদমের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছান ও তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। রাজ্য কমিটির সদস্য ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ছাড়াও মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান, কমরেডস সাধনা চৌধুরী, হাসি হোড়, অমিতাভ চ্যাটার্জী প্রমুখ রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রবীন রায়। তাঁর পুত্র ও আত্মীয় স্বজনরাও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড অনিমা কর্মকার লাল সেলাম

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া গ্রামের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মী কমরেড আব্দুস সামাদ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৭ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দলের কর্মী, সমর্থক, দরদী ও এলাকার শত শত মানুষ তাঁকে শেষ দেখার জন্য উপস্থিত হন। রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায়, লোকাল সম্পাদক কমরেড রাইহান বিশ্বাস প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড সামাদ দরিদ্র চাষি পরিবারের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরিবারের প্রয়োজনে তিনি খুব অল্প বয়সে স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেন এবং স্বল্প সময়েই ছাত্র-দরদী প্রিয় শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হন। ষাটের দশকের শেষের দিকে কমরেড সামাদ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সঙ্গে পরিচিত হন ও নিজেকে অতি দ্রুত এলাকার সুদক্ষ সংগঠক হিসাবে গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে দলের সাথে যুক্ত করেন। খাস ও বেনাম জমি উদ্ধার, ইংরেজি ও পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর স্কুলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো বহাল রাখেন। এই অপরাধের শাস্তি হিসাবে তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। এই বলিষ্ঠ কমরেডের মৃত্যু দল এবং গণআন্দোলনের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি।

কমরেড আব্দুস সামাদ লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

আবার বিদ্যুতের মাশুল বাড়ল

একের পাতার পর

বিশ্বাস বলেছেন, পূর্বতন সিপিএম সরকারের নির্দেশে কমিশন এই কালা রেগুলেশন চালু করে মাশুল বাড়িয়েছে। গ্রাহকদের প্রতি এ এক গভীর চক্রান্ত।

অ্যাবেকার বক্তব্য, এই মাশুলবৃদ্ধি সম্পূর্ণ বেআইনি। কারণ বিদ্যুৎ আইনের ৬২(৪) ধারায় স্পষ্টই বলা হয়েছে, সাধারণভাবে বছরে একবারের বেশি মাশুল (ট্যারিফ) পরিবর্তন করা যাবে না। কেবলমাত্র ফুয়েল সারচার্জের ক্ষেত্রে ফরমুলা অনুযায়ী অতিরিক্ত পাওনা থাকলে তা আদায় করা যেতে পারে। বর্তমানে কয়লার দামবৃদ্ধির কথা বলা হলেও কত দাম বেড়েছে এবং তার জন্য কোম্পানির অতিরিক্ত কত খরচ হয়েছে তার কোনও হিসাব কমিশনের এবং গ্রাহকদের কাছে পেশ না করে, গ্রাহকদের মতামত প্রকাশের কোনও সুযোগ না দিয়েই মাশুল বৃদ্ধি ঘোষণা করা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যুৎ আইন বিরোধী। উভয় কোম্পানি এই কাজটি করেছে কমিশনের একটি বেআইনি রেগুলেশনের ভিত্তিতে। কমিশন কোনও শুনানি না করে নতুন ট্যারিফ রেগুলেশন তৈরি করেছে। এই রেগুলেশনের ২.৮.৭.৩ ধারায় বলা হয়েছে বিদ্যুৎ কোম্পানি ইচ্ছা করলে প্রতি মাসেই ফুয়েল সারচার্জ /ভ্যারিয়েবল চার্জ/ বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত মাশুল নিতে পারবে। তার জন্য প্রতি মাসে অগ্রিম কোনও হিসাব দিতে হবে না, বছরের শেষে হিসাব দাখিল (এপিআর) করলেই চলবে। কমিশনের এই অগণতান্ত্রিক গ্রাহক স্বার্থবিরোধী রেগুলেশন যা মূল আইনবিরোধী, তাকে ভিত্তি করেই এই মাশুলবৃদ্ধি করা হয়েছে। অত্যন্ত বিপদের কথা হল, এই রেগুলেশনের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলি তাদের খুশিমতো প্রতি মাসেই মাশুলবৃদ্ধি করে যাবে। অথবা প্রতি মাসে কিছু কিছু করে বাড়িয়ে প্রতি বছরই ব্যাপক হারে নানা নামে মাশুল বাড়িয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণহীন মাশুলবৃদ্ধির এই অধিকার কোনওমতেই কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া যায় না।

সরকার পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে হঠাৎ কেন এই মাশুলবৃদ্ধি? আসলে গত ৪ এপ্রিল বিদ্যুতের অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল (আদালত) ২০১০-১১ সালের ঘোষিত মাশুল অর্ডারকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে বাতিল করতে বলায় রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির গ্রাহকদের মাশুল গড়ে ইউনিট প্রতি ৪৪ পয়সা কমে যায়। কেন ঐ মাশুলবৃদ্ধি বেআইনি ছিল? কারণ আইন অনুযায়ী গ্রাহকদের কোনও মতামত না নিয়েই বা কোনও শুনানি না করেই একতরফাভাবে মাশুল বাড়ানো হয়েছিল। ফলে তা বাতিল হওয়ায় ৪৪ পয়সা হারে মাশুল কমে যায়। গ্রাহকরা যাতে কোনও মতেই এই রিলিফ উপভোগ করতে না পারে এবং কোম্পানিকে যাতে কোনও মতেই দাম কমাতে না হয় সেজন্য অত্যন্ত দ্রুততায় রেগুলেশন তৈরি করে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাম বাড়ানো হল। এবং ধূর্ততার সাথে তারা এমন সময় বেছে নিল যখন মানুষ বহু প্রতীক্ষিত পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এভাবে কি মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখা যায়? গ্রাহকদের শোষণ করার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গ্রাহক স্বার্থ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ১৯ মে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দপ্তরের চেয়ারম্যান প্রসাদরঞ্জন রায়কে ঘেরাও করা হয়। কমিশনের অপর দুই সদস্যও দু'ঘণ্টা ঘেরাও থাকেন।

অ্যাবেকার দাবি ঃ (১) অবিলম্বে সিইএসসি-তে ৪৬ পয়সা ও এসইডিসিএলএ ৩৮ পয়সা মাশুলবৃদ্ধি (ভ্যারিয়েবল চার্জ বৃদ্ধি) বাতিল করতে হবে, (২) গ্রাহকদের বক্তব্য না শুনে, শুনানি না করে কোনও প্রকার চার্জ বৃদ্ধি করা চলবে না, (৩) বেআইনি (নতুন সংশোধিত) ট্যারিফ রেগুলেশন বাতিল করতে হবে, (৪) বিধানসভায় পেশ না করে ট্যারিফ রেগুলেশন চালু করা চলবে না, (৫) জনস্বার্থবিরোধী চক্রান্তকারী বর্তমান বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে পদত্যাগ করতে হবে।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র বলেন, যতদিন না চেয়ারম্যান সহ এই কমিশন পদত্যাগ করছে এবং এই মাশুল প্রত্যাহার করা হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলবে। কমিশনে আগামী ২০১১-১২ সালের জন্য মাশুলবৃদ্ধির যে আবেদন জমা পড়েছে তা অবিলম্বে খারিজ করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতি মাসে মাশুল বাড়লে গরিব, মধ্যবিত্ত, গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। তিনি জনসাধারণ ও বিধানসভায় নবনির্বাচিত সদস্যদের মাশুলবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান অতি দ্রুত কমিশনের মিটিং করে দাবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও অ্যাবেকার সাথে আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহকদের আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অনশনরত মেধা পাটকরের অবস্থার অবনতি

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে কমরেড প্রভাস ঘোষের চিঠি

মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহানকে ২৩ মে এক চিঠিতে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ লিখেছেন,

''আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রখ্যাত সমাজকর্মী শ্রীমতী মেধা পাটকর চার দিন যাবৎ অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। কয়েক হাজার বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করে 'শিবালিক বিল্ডার্স' কোম্পানি মুম্বইয়ের কাছে বান্দ্রায় ধনী ব্যক্তিদের জন্য বিলাসবহুল আবাসন নির্মাণের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদেই এই অনশন।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে আপনি শ্রীমতী পাটকরের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের ব্যবস্থা করুন।''

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিবাদ

একের পাতার পর

কোম্পানি-তে ইউনিট প্রতি ৩৮ পয়সা ফুয়েল সারচার্জ বা ভ্যারিয়েবল কস্ট হিসাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া আরও জানা গেছে যে, কিছু দিনের মধ্যে ইউনিট প্রতি আরও ৩২ পয়সা বৃদ্ধি করা হবে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে মাশুল বাড়বে ইউনিট প্রতি ৭০ পয়সা। সিইএসসিতে কত বাড়বে এখনও তা জানা না গেলেও এই বৃদ্ধি যে ইউনিট প্রতি ৭০ পয়সার কম হবে না, এটা রাজ্যবাসীর আশঙ্কা। এই বিশাল মাশুলবৃদ্ধি ঘটেছে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নয়া রেগুলেশনের জন্য।

আমরা মনে করি, এই রেগুলেশন চরম জনস্বার্থবিরোধী এবং বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের অন্যায়ভাবে বিপুল মুনাফা লোটার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই বিগত বামফ্রন্ট সরকারের মদতে এটি তৈরি হয়েছিল।

আমরা এই মাশুলবৃদ্ধি রোধের জন্য তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

রাশিয়ায় তরুণদের বুকে স্ট্যালিন এখনও জীবিত

পাঁচের পাতার পর

অসাধারণ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাসকে, শপথ নেন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করার। আজকের পুঁজিবাদী রাশিয়ার সরকার যে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে বিরাজ করছে, এ বছর ৮ মে দিনটি পালন করেছেন তাদের অস্ত্রসজ্জার বহর প্রদর্শনের মাধ্যমে। কিন্তু সে দেশের তরুণ-যুবক ও সাধারণ মানুষ ৮ মে দিনটিকে বিশ্বের ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে পালন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপরাজেয় সেনাপতি, সমাজতন্ত্রের রক্ষাকর্তা মহান স্ট্যালিনের ছবি ছিল তাঁদের বুকে, কণ্ঠে ছিল রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার শপথ।

গুজরাটে বিজেপি সরকারের দুধের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

দুধের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৮ এপ্রিল আমেদাবাদে বিক্ষোভ

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।